শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ জাহিলিয়্যাহ দ্বারা উদ্দেশ্য

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ ড. ছলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

জাহিলিয়্যাহ দ্বারা উদ্দেশ্য

(الجاهلية) আল-জাহিলিয়্যাহ শব্দটি (الجهل) আল-জাহ্‌ল থেকে এসেছে। জাহ্‌ল অর্থ হলো জ্ঞানহীনতা, জ্ঞানশূন্যতা। আর জাহিলিয়্যাহ বলা হয় সেই সময়কে, যখন কোন রসূল ও কিতাব ছিল না। এখানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হওয়ার পূর্বের অবস্থাকে জাহিলিয়্যাহ বলা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না (সূরা আল আহযাব ৩৩:৩৩)।

এখানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হওয়ার পূর্বের অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তখন গোটা মানবজাতি ভ্রষ্টতা, কুফরী ও নাস্তিকতায় ডুবে ছিল। কারণ কুরআনের পূর্বের রিসালাত বা আসমানী কিতাব নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। ইয়াহূদীরা তাদের কিতাব তাওরাতকে বিকৃত করে। তারা তাতে অনেক কুফরী, ভ্রষ্টতা ও নোংরা কথা সংযোজন করে। এমনিভাবে খ্রিষ্টানরাও ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপর ইনজিল নাযিল হওয়ার সময় তা যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থা থেকে পরিবর্তন করে। ইনজিল পরিবর্তনকারী ব্যক্তির নাম (بلس) বালাস/বুলাস অথবা (شاول) শাবিল। সে ছিল ইয়াহূদী এবং নাবী ঈসা আলাইহিস সালাম এর প্রতি বিদ্বেষী। এ লোক ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম এর দীনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সে ঈসা আলাইহিস সালাম এর উপর ঈমান আনার ভাব দেখায়। সে প্রকাশ করে যে, সে ঈসা আলাইহিস সালাম এর সাথে পূর্ব শত্রুতার জন্য অনুতপ্ত। তার দাবী অনুযায়ী সে একটি স্বপ্ন দেখার পর ঈসা আলাইহিস সালাম এর উপর ঈমান আনে। খ্রিষ্টানরা তার কথাকে সত্যায়ন করল। অতঃপর সে ঈসা আলাইহিস সালাম এর উপর অবতীর্ণ ইনজিল নিল। তারপর সে ইনজিল কিতাবে পৌত্তলিকতা, শিরক ও কুফরী ঢুকিয়ে দেয়।

এমনকি তাতে ত্রিত্ববাদও উল্লেখ করে অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা তিন উপাস্যের একজন (না‘ঊযুবিল্লাহ)। আর ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র অথবা তিনি আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ)। সে তাতে ক্রুশের ইবাদতের বিষয়টি প্রবেশ করায়। এছাড়া আরো অন্যান্য ঘৃণ্য কুফরী সে তাতে প্রবেশ করায়। আর খ্রিষ্টানরা তাকে আলিম এবং ইনজীলে বিশ্বাসী মনে করে এসব ব্যাপারে তার কথার সত্যায়ন করে। তাদের দাবি অনুযায়ী, তারা তাকে বালাস অথবা ঈসা আলাইহিস সালাম এর দূত (রসূল) বলে গণ্য করে । ঈসা আলাইহিস সালাম এর দীনে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়াই তার লক্ষ্য ছিল। তার ইচ্ছা পূরণ হয়। পৌত্তলিকতা, ত্রিত্ববাদ এবং ঈসা আলাইহিস সালাম কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করার আক্বীদা অথবা তিনি তিন জনের একজন, এসবের মাধ্যমে সে ঈসা আলাইহিস সালাম এর দীনকে নষ্ট করে। সে তাতে অনেক পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং খ্রিষ্টানরাও তাকে মেনে নেয়। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হওয়ার পূর্বে এটা ছিল আহলে কিতাবদের অবস্থা। তবে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক সঠিক দীনের উপর ছিল। তাদের অধিকাংশই কুফরী ও আল্লাহর দীনের পরিবর্তনের উপর ছিল।

আরবরা দু’ভাগে বিভক্ত:

(১) পূর্ববর্তী দীনের অনুসারী। যেমন-ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজক

(২) একনিষ্ঠ দীনে বিশ্বাসী। ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম এর দীনে বিশ্বাসীরা। বিশেষত হিজায ও মক্কা অঞ্চলে।

তাদের মাঝে একজন লোক ছিল, তার নাম আমর ইবনু লুহাই আল-খুযাঈ। তিনি হিজাযের শাসক ছিলেন। তিনি ইবাদত, ন্যায়নিষ্ঠতা ও যথাযথ ধার্মিকতা প্রকাশ করতো। তিনি চিকিৎসার জন্য সিরিয়া গমন করেন। সেখানে সিরিয়াবাসীকে মূর্তিপূজায় লিপ্ত দেখে তা ভাল মনে করেন। এ কারণে চিকিৎসা শেষে সিরিয়া থেকে কিছু মূর্তি নিয়ে ফিরে আসেন। তিনি ঐসব মূর্তি খুঁজতে থাকেন, যা নুহ আলাইহিস সালাম এর যুগের পর ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশে যায়।

মূর্তিগুলো হলো: ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগূস, ইয়াউক্ব, নাসর ইত্যাদি। তুফানে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে যায়। তারপর শয়তান এসে ঐ সব মূর্তির জায়গাসমূহ দেখিয়ে দেয়। এরপর সে মূর্তি খুঁজে বের করে। তারপর আরবের বিভিন্নণ গোত্রের মাঝে মূর্তিগুলো বণ্টন করে দেয় এবং সেগুলোর ইবাদতের আদেশ করে। আরববাসীরা তার নিকট থেকে মূর্তিগুলো গ্রহণ করে। এভাবে হিজায ও আরবের অন্যান্য এলাকায় শিরকের বিস্তার ঘটে। তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দীনকে পরিবর্তন করে। আর তারা ঐ সব মূর্তিগুলোর নামে চতুষ্পদ জন্তু ছেড়ে দেয়।

এজন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরকে জাহান্নামে হাড় টানাটানি করতে দেখেন অর্থাৎ সে তার নাড়িভূড়ি টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে মানুষ স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল। কিতাবধারী, উম্মি (নিরক্ষর) ও অন্যান্য সবাই পথভ্রষ্ট ছিল। তবে কতিপয় আহলে কিতাব সঠিক দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তারা নবুওয়াতের পূর্বে শেষ হয়েছে। ফলে, যমীনে অন্ধকার ভরে যায়। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবীবাসীর প্রতি দৃষ্টি ফিরালেন। অতঃপর আরব-অনারব সবার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করলেন অর্থাৎ ক্রোধ দেখালেন। তবে কতিপয় আহলে কিতাব ব্যতীত।[1]

এই ঘোর অমানিশা, চূড়ান্ত জাহিলিয়্যাত, পথহারা পরিবেশ এবং আসমানী রিসালাত ও কিতাবের অনুপস্থিতিতে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তা‘আলা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিক্বমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল। (সূরা আলে ইমরান ৩:১৬৪)।

তারা পূর্বে স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় ছিল অর্থাৎ নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে ভ্রষ্ট ছিল

পূর্বে জাহিলিয়্যাহ (الجاهلية) শব্দের বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, এটি (الجهل) থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো

জ্ঞানশূন্যতা, মূর্খতা। আর যা কিছু জাহিলিয়্যাতের দিকে সম্বন্ধিত, তা-ই নিন্দনীয়। এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى

তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না (সূরা আল আহযাব ৩৩:৩৩)।

আল্লাহ তা‘আলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীদেরকে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। এখানে সৌন্দর্য প্রকাশের অর্থ হলো, হাট-বাজার ও মানুষের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা। কেননা, জাহিলী যুগের মহিলারা সৌন্দর্য প্রকাশ করতো; বরং গোপন অঙ্গও প্রকাশ করে দিতো। যেমন-কাবা তাওয়াফের সময়ও মহিলারা অহংকারবশত সৌন্দর্য প্রকাশ করতো। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ

যখন কাফিররা তাদের অন্তরে আত্ম-অহমিকা পোষণ করেছিল, জাহেলী যুগের আহমিকা (সূরা আল ফাতাহ ৪৮:২৬)।

এখানে নিন্দা অর্থে এটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ জাহিলী অহমিকা প্রদর্শন নিকৃষ্ট কাজের অন্তর্ভুক্ত। কোন এক যুদ্ধে আনসার ও মুহাজির দু’জন লোকের মাঝে দ্বন্দ্ব হয়। তারা উভয়ে নিজ নিজ গোত্রের লোকদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকতে থাকেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেয়ে তাদেরকে বললেন,

أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟! دعوها فإنها منتنة

‘তোমরা কি জাহিলদের মত ডাকাডাকি শুরু করেছ? অথচ আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান। এ ধরণের হাঁকডাক ছেড়ে দাও, কেননা তা নিকৃষ্ট কাজ।[2]

অর্থাৎ গোত্র নিয়ে দ্বন্দ্ব খারাপ কাজ। মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। আনসার ও মুহাজিরের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। বিভিন্ন গোত্রের মাঝেও কোন পার্থক্য নেই। বিশ্বাসগতভাবে তারা ভাই ভাই এবং একটি দেহ ও নির্মিত ভবনের মত, যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরস্পর সম্পৃক্ত। মুসলিমদের উপর আবশ্যক হলো, আরব ও অনারব এবং বিভিন্ন বর্ণ গোত্রের মাঝে তাক্বওয়া (আল্লাহ ভীরুতা) ছাড়া পার্থক্য সৃষ্টি না করা। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন (সূরা আল হুজরাত ৪৯:১৩)। তিনি আরো বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও (সূরা আল হুজরাত ৪৯:১০)।

অতএব, বংশ ও গোত্রের অহমিকা জাহিলী কাজ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

‘যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো, অথচ তার কাঁধে আনুগত্যের বাই‘আত নেই, সে জাহিলিয়্যাতের উপর মৃত্যুবরণ

করলো’।[3]

কারণ, জাহিল জাতি হলো নৈরাজ্যবাদী। তারা কোন আমীর-শাসক বা সুলতান-সম্রাটকে পরোয়া করে না। এ হলো জাহিলীদের অবস্থা।

সারকথা হলো, জাহিলী সব কর্মকাণ্ড নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয়। জাহিলদের মতো কর্মকাণ্ড করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর জাহিলী যুগের সমাপ্তি হয়। নবুওয়াতের পর সাধারণ জাহিলিয়্যাতের অবসান হয়। মানুষের মাঝে দীনের জ্ঞান চর্চা ও ঈমান ফিরে আসে। কুরআন-সুন্নাহ নাযিল হয়, জ্ঞানচর্চা চলতে থাকে। ফলে জাহিলিয়্যাত তথা অজ্ঞতা দূরীভূত হয়। কেননা যতক্ষণ কুরআন, হাদীছ এবং বিদ্বানদের কথা চর্চা হয়, ততক্ষণ জাহিলিয়্যাত থাকতে পারে না। ঐ সময় সাধারণ জাহিলিয়্যাতের অবসান হয়। তবে কিছু মানুষ অথবা গোত্র অথবা কিছু অঞ্চলে জাহিলিয়্যাত থাকতে পারে অর্থাৎ আংশিক জাহিলিয়্যাত থাকতে পারে।

এক ব্যক্তি তার ভাইকে ‘হে কালোর বেটা!’ বলে গালমন্দ করছিলেন, তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

أعيّرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية

‘তুমি কি তার মায়ের নাম ধরে গালি দিলে? তুমিতো এমন লোক, যার মাঝে এখনও জাহিলিয়্যাত আছে’।[4]

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم

আমার উম্মাতের মাঝে চারটি জাহিলিয়্যাতের রীতি চালু থাকবে, যা তারা পরিত্যাগ করবে না: গোত্রের গৌরব করা। বংশ মর্যাদার খোঁটা দেয়া। মৃতের জন্য কান্না-বিলাপ করা। তারকারাজীর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা’।[5]

হাদীছটি প্রমাণ করে, কিছু মানুষের মাঝে এ নিকৃষ্ট জাহিলী রীতি চালু থাকবে। তবে এসবের মাধ্যমে তারা কাফির হবে না। আল্লাহর রহমতে সাধারণ জাহিলিয়্যাত দূরীভূত হয়েছে। এ জন্য বলা বৈধ নয় যে, মানুষ জাহিলিয়্যাতের মধ্যে আছে অথবা জাহিলী জগত। কেননা এভাবে বলা রিসালাত ও কুরআন-সুন্নাহকে অস্বীকার করার অন্তর্ভুক্ত। তাই এটা বলা বৈধ নয়।

বরং এভাবে বলতে হবে যে, কিছু মানুষের মাঝে জাহিলিয়্যাত আছে অথবা কিছু ব্যক্তি জাহিলী স্বভাবের। অথবা জাহিলী স্বভাবের কিছু অংশ বিদ্যমান। এভাবে বললে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াত লাভের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের মাঝে পার্থক্য সূচিত হবে।

কিছু মানুষ বলতে পারে, জাহিলিয়্যাত যেহেতু শেষ হয়েছে, তাহলে জাহিলী বিষয়সমূহ আলোচনার প্রয়োজন কি? আমরা তো মুসলিম। প্রশংসা আল্লাহরই।

জবাব হলো, জাহিলী সমস্যা থেকে বেঁচে থাকা। এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে মানুষ সতর্ক হবে। তা না হলে মানুষ বুঝবে না। তখন সে তাতে জড়িয়ে যেতে পারে। জাহিলী কর্ম থেকে সতর্ক ও বিরত থাকার জন্য এ সম্পর্কে

আলোচনা ও গবেষণা হওয়া দরকার।

কবি বলেন: আমি জেনেছি মন্দ, প্রয়োগের জন্য নয়, যেন তাতে সদা সতর্কতা রয়, যে জানেনি তাহা, ডুবে রবে সেথায়।

জাহিলী সমস্যা সম্পর্কে জানার এটি প্রথম দিক। আর দ্বিতীয় দিক হলো যখন জাহিলিয়্যাত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন হবে তখন ইসলামের মর্যাদা বুঝা যাবে। কবি বলেন:

মন্দের বিপরীতে ভাল প্রকাশ পায়। বিপরীতমুখী বিষয় দ্বারা অনেক কিছু জানা যায়।

উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية

‘ইসলামের রশি একটা একটা করে ছিড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তখনই, যখন কেউ ইসলামের ছায়ায় বড় হয়েও জাহিলিয়্যাত সম্পর্কে জানবে না’। সুতরাং জাহিলী বিষয়ে মানুষ অজ্ঞ হলে জাহিলী কর্মে লিপ্ত হতে পারে। কেননা শয়তান জাহিলী কর্ম ভুলে যায়নি এবং সে অসচেতনও নয়, বরং সে জাহিলী কাজ কর্মের দিকেই মানুষকে ডাকে।

শয়তান ও তার অনুসারীরা ভ্রষ্টতার দিকে আহবানকারী, জাহিলী কর্ম উজ্জীবিত করা, শিরক, বিদ‘আত, কুসংস্কার ও প্রাচীনত্বের দিকে তারা ডাকতেই থাকে। এসবের উদ্দেশ্য হলো: ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা ও মানুষকে জাহিলিয়্যাতের দিকে ডাকা। সুতরাং জাহিলিয়্যাত থেকে বিরত ও দূরে থাকার জন্য এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানার্জন আবশ্যক।

শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘সবচেয়ে ভয়াবহ ও মারাত্মক জাহিলিয়্যাত হচ্ছে, অন্তরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর নাযিলকৃত ওহীর প্রতি বিশ্বাস না রাখা’। কেননা জাহিলরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তাকে বিশ্বাস করে না। আর তারা আল্লাহ তা‘আলার পথ নির্দেশনা গ্রহণ করে না, যা তিনি নিয়ে এসেছেন। শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘এর সাথে যদি জাহিলরা যে নীতি অবলম্বন করতো, তা যুক্ত হয়, তাহলে ক্ষতি পূর্ণতা লাভ করবে’। অর্থাৎ প্রকাশ্য ও গোপনে ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা) ছড়িয়ে পড়বে।

গোপন ফাসাদ হচ্ছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস না থাকা। আর প্রকাশ্য ফাসাদ হচ্ছে জাহিলী বিষয়সমূহকে ভাল মনে করে পালন করা। এভাবে প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় ধ্বংস হলে তখন ক্ষতি পূর্ণতা পায়। আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এটাই হলো জাহিলিয়্যাত সম্পর্কে না জানার কুফল। সুতরাং জাহিলরা যেসব কুনীতির উপর ছিল, তাকে ভাল মনে করা বৈধ নয়। বরং আবশ্যক হলো, এটাকে অস্বীকার করা ও তা জঘন্য মনে করা। সেজন্য, যারা জাহিলী কর্মকে ভাল মনে করে, তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে শাইখের দলীল:

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

যারা বাতিলে বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত (সূরা আল আনকাবূত ২৯:৫২)।

বাতিলের প্রতি ঈমান এনেছে অর্থাৎ বাতিলকে বিশ্বাস করেছে। বাতিল হলো হক্কের বিপরীত। কোন বিষয় হক্কের বিরোধী হলে তা বাতিল বলে গণ্য। বাতিল হলো উদ্ভূত ধ্বংসশীল বিষয়, যাতে কোন উপকার নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

অতঃপর সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া কী থাকে? অতএব কোথায় তোমাদেরকে ফেরানো হচ্ছে? (সূরা ইউনূস ১০:৩২)।

ফুটনোট

[1]. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ ১৭৪৮৪।

[2].ছ্বহীহ বুখারী ৩৫১৮, ৪৯০৫; মুসলিম ২৫৮৪।

[3]. ছ্বহীহ মুসলিম ১৮৫০।

[4]. ছ্বহীহ বুখারী ৩০, ২৫৪৫, ৬০৫০।

[5]. ছ্বহীহ বুখারী, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৩৪।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8977

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন